‘বেচি দই, কিনি বই’

মাসুম আওয়াল

বই নিয়ে দারুণ এই উক্তিটি শুনলেই চোখের সামনে একজন মানুষের ছবি ভেসে ওঠে। যার জীবনের গল্প শুনলে নতুন করে ভাবতে ইচ্ছা করে। মনে হয় সমাজের জন্য এভাবেও কাজ করা যায়? কাকে নিয়ে এতো কথা? তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন একজন সাধারণ দইওয়ালা জিয়াউল হক। ২০২৪ সালে সমাজসেবায় একুশে পদক পেয়েছেন তিনি। জেনে নেওয়া যাক কীভাবে একুশে পদক অর্জন করলেন অতি সাধারণ মানুষ জিয়াউল হক।

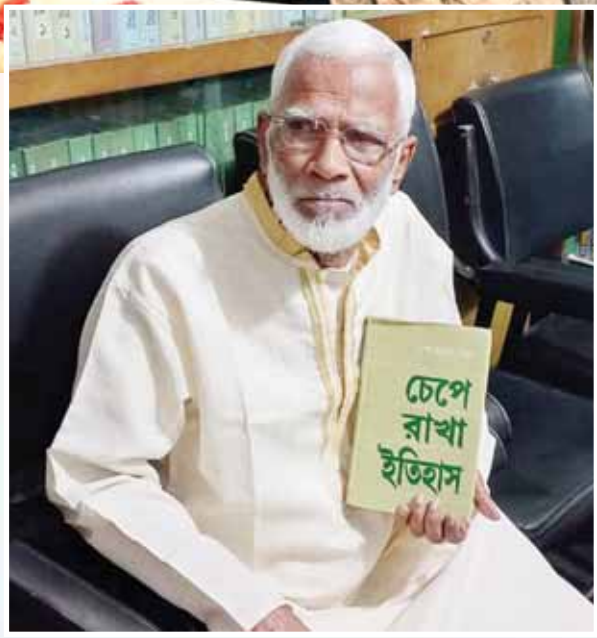

জীবনের গল্প

১৯৩৪ সালের ৬ জুন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বর্তমান ভোলাহাট উপজেলায় এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন জিয়াউল হক। তার পিতার নাম তৈয়ব আলী মোল্লা এবং মাতা শরীফুন নেছা। অর্থের অভাবে বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারেননি জিয়াউল। এক গণমাধ্যমে এই গুণী মানুষটি জানিয়েছেন, ১৯৫৫ সালে পঞ্চম শ্রেণি পাস করে ষষ্ঠ শ্রেণিতে আর ভর্তি হতে পারেননি তিনি। বাড়ি বাড়ি গরুর দুধ দোহন করে জীবিকা নির্বাহ করা বাবা বই কেনার জন্য তাকে দেড় টাকা দিতে পারেননি। তাই প্রাইমারি পাস করেই বন্ধ যায় লেখাপড়া।

ছোটবেলাতেই ধরলেন সংসারের হাল

ভেঙে পড়েননি জিয়াউল হক। মা-বাবার সংসারে বোঝা হয়ে না থেকে ছোটবেলাতেই ধরার চেষ্টা করেন সংসারের হাল। বাবা তৈয়ব আলী মোল্লার সংগ্রহ করা দুধ দিয়ে দই তৈরি করে ফেরি করে বিক্রি করা শুরু করেন জিয়া। ব্যাবসার হাতেখড়ি হয় তার। কয়েক বছরের মধ্যে দই বিক্রি করে কিছু টাকাও জমিয়ে ফেলেন। আর হাতে টাকা আসার পরেই তার মাথায় নতুন স্বপ্নের কুঁড়ি উঁকি দেয়। জিয়াউল হক ভাবেন অর্থের অভাবে তার মতো যেন কারো লেখাপড়া বন্ধ হয়ে না যায়।

অন্যদের মাঝে নিজের স্বপ্নপূরণ

জিয়াউল হক নিজের স্বপ্নপূরণ করলেন অনেক দুখি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে। যারা তার মতো টাকার অভাবে বই কিনতে পারে না, তাদের তিনি নিজের উপার্জনের টাকা দিয়ে বই কিনে দিতে শুরু করেন। গরিব ছাত্রদের মধ্যে বই বিলি করেন খোঁজ নিয়ে। প্রাথমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণির ছাত্রদের বই দিতে থাকেন জিয়াউল। তার দেওয়া বই পড়ে ও আর্থিক সহায়তা পেয়ে অনেকেই স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে চাকরি করছেন। অনেক বড় বড় মানুষ তৈরি করেছেন তিনি। আর তাদের মাধ্যমেই নিজের পড়ালেখা করতে না পারার কষ্ট দূর হয়েছে। এখন জিয়াউল হক নিজেই যেন বিশাল এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে আমাদের।

সাধারণ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা

দই বিক্রি করা টাকায় এক বিশাল বইয়ের ভান্ডার গড়ে তুলেছেন জিয়াউল হক। ১৯৬৯ সালে নিজের বাড়ির একটি ঘরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘জিয়াউল হক সাধারণ পাঠাগার’। এ পাঠাগারে এখন ১৪ হাজার বই আছে। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের বইও আছে। সব বই রাখার স্থান না হওয়ায় সেই বইগুলো বর্তমানে রাখা আছে মুসরিভূজা ইউসুফ আলী হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজসহ আশপাশের কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠাগারে। এক গণমাধ্যমে জিয়াউল হক বলেন, ‘শুধু পাঠ্যবই পড়ে ছাত্রদের জ্ঞান অর্জন হবে না মনে করেই আমি নিজের

নামে সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করেছি। ১৯৯৩ বা তারও পরে ভোরের কাগজে 'দইওয়ালার বই ভান্ডার' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের তৎকালীন কর্মকর্তা ও বর্তমানের টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান আমার বাড়িতে এসে পাঠাগারের জন্য এক লাখ টাকা অনুদান দিলে পাঠাগার সমৃদ্ধ হয়। পরে প্রথম আলোসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে আমাকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে প্রবাসে থাকা মানুষজন, দেশের বিভিন্ন স্থানের মানুষজন আমাকে আর্থিক সহায়তা দিতে থাকেন। আমি কলেজ পর্যায়ের গরিব ছাত্রদের মধ্যে বই বিলির পাশাপাশি গরিব-অসহায় মানুষ ও এতিমদের সাহায্য করতে সমাজসেবামূলক কাজে নেমে পড়ি। এ জীবনে অনেক সম্মাননা পেয়েছি। তবে একুশে পদক কখনো পাব ভাবিনি।'

ঘরে চাল নেই, সাংবাদিকের ভিড়

জিয়াউল হক একুশে পদকের জন্য মনোনীত হওয়ায় গ্রামের মানুষ, আত্মীয়স্বজন, সাংবাদিকরা যখন বাড়িতে ভিড় জমিয়েছেন তখনও দই বিক্রি করে বেড়াচ্ছেন ৯০ বছর বয়সী জিয়াউল হক। তাকে অভিনন্দন জানাতে এসে ফুলের তোড়া নিয়ে ঘুরছেন অনেকেই। এক গণমাধ্যম কর্মী জিয়াউল হককে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে দেখেন তিনি পাশের গোমস্তাপুর উপজেলা সদর রহনপুর স্টেশন বাজারে দই বিক্রি করতে গেছেন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রহনপুর স্টেশন বাজারে গিয়ে দেখা যায়, একটি ওষুধের দোকানের সামনে বসে দই বিক্রিতে ব্যস্ত জিয়াউল হক। সাংবাদিককে তিনি জানান, 'দই ও ক্ষীর নিয়ে আমি সকাল সাতটায় বের হয়েছি। চাল কেনা ও বাজার করার টাকা ছিল না।' সেইদিন পথের পাশে দই কিনতে এসে ক্রেতারাও জিয়াউল হককে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন, তার সঙ্গে সেলফি তুলছিলেন। দেখার মতো দৃশ্য ছিল সেটি।

একুশে পদক পেয়ে অনুভূতি

জিয়াউল হকের একুশে পদক প্রাপ্তিতে আনন্দে ভেসেছে ভোলাহাটসহ পুরো চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা। তাকে অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন। জিয়াউল হক নিজেও এ প্রাপ্তিতে খুশি হয়েছেন। জানিয়েছেন এই পুরস্কার পাওয়ার অনুভূতি। জিয়াউল হক বলেন, গত বছরের আগস্ট মাসে রাষ্ট্রীয়ভাবে একুশে পদকের জন্য তালিকা প্রস্তুত করা হয়। বিষয়টি জানতে পেরে আমি যোগাযোগ করি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসকের (ডিসি) সঙ্গে। এরপর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ভোলাহাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে যাই। তৎকালীন ইউএনও আমার কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে চূড়ান্ত মনোনয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠান। এরপর গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সালের একুশে পদকের জন্য আমার নাম ঘোষণা করা হয়। জিয়াউল হক আরও বলেন, 'কল্পনা করতে পারিনি, যে আমি এত বড় একটা পদক পাওয়ার জন্য মনোনীত হব। জীবনের শেষ দিকে এসে কাজের স্বীকৃতি

পেলাম। এখন মরেও শান্তি পাব। কী যে আনন্দ পেয়েছি, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।'

যা বললেন প্রধানমন্ত্রী

২০ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'একুশে পদক' প্রদান অনুষ্ঠানে জিয়াউল হক সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দারিদ্র্যের কারণে নিজে লেখাপড়া করতে পারেননি। এটা নিয়ে তার ভেতরে একটা দুঃখ যন্ত্রণা ছিল। কিন্তু তিনি থেমে যাননি। সাধারণ কাজ করে, দই বিক্রির ছোট্ট দোকান দিয়ে তিনি নিজের জীবন জীবিকা এবং সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন। পাশাপাশি অন্যের মাঝে জ্ঞানের আলো বিতরণ করবার জন্য তিনি পাঠাগার তৈরি করেন এবং সাধারণ মানুষকে পড়াশোনার সুযোগ করে দেন। তিনি একটি স্কুল তৈরি করেছেন। তাকে এই পুরস্কার তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত এই কারণে যে, সারাদেশে যদি আমরা খোঁজ করি এরকম বহু গুণীজন পাবো। হয়তো দারিদ্র্য কিংবা সামাজিক কারণে তারা তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ পাননি; কিন্তু সমাজকে কিছু তারা দিয়েছেন। তিনি যে পাঠাগারটা করেছেন তার জন্য আমার কাছে কিছুদিন আগে বললেন যে, একটা স্থায়ী ভূমি এবং একটা বিল্ডিং দরকার। আমি করে দেব। শুধু তাই না, যে স্কুলটা করেছেন সেটাও তিনি চান যেন সরকারিকরণ করা হয়। আমি স্কুলটার খোঁজ-খবর নেবো এবং যথাযথভাবে এটা করে দেব। কেন করে দেব? যে মানুষটা জীবনে এত বড় ত্যাগ স্বীকার করতে পারে তাদের জন্য করা আমার দায়িত্ব। আমি শুধু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বলছি না, আমি জাতির পিতার কন্যা হিসেবে বলছি। আমি যদি প্রধানমন্ত্রী নাও থাকতাম এবং আগে এই তথ্যটা পেতাম তাহলে আমরা নিজেরাই চেষ্টা করতাম।'

জিয়াউল হকের পরিবার

জিয়াউল ব্যক্তিগত জীবনে দুই কন্যা ও এক ছেলে সন্তানের জনক। প্রথম স্ত্রী সারাবান তহুরার মৃত্যুর পর তিনি ফরিদা হকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। জিয়াউল হকের ছেলে মহব্বত হক বাবার একুশে পদক অর্জনে উচ্ছ্বসিত ও গর্বিত। তিনি বলেন, 'এমন বাবার সন্তান হয়ে আমি গর্বিত। বাবার অনুপস্থিতিতে বাবার কাজ চালিয়ে যাব।'

শেষ কথা

এমন জিয়াউল হকদের জীবনের গল্প বলে শেষ হয় না। তাকে নিয়ে বিস্তারিত জানতে একবেলা ঘুরে আসা যেতে পারে তার সবুজ গ্রামে।